সূরা আলে ইমরান - ৩

মদীনায় অবতীর্ণ

আয়াত সংখ্যা ২০০

(মূল বিষয়)

ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে তুলনা

(উপ বিষয়)

খ্রিস্টধর্মের বাস্তবতা

- ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে পার্থক্য এবং সংলাপের নীতি
- খ্রিস্টধর্ম এবং একত্ববাদের বিশ্বাস
- খ্রিস্টধর্ম এবং নবুওতের প্রতি বিশ্বাস

মুসলিম উম্মাহর প্রশিক্ষণ

- মুসলিম উম্মার পাঁচটি সাংগঠনিক নীতি
- মুসলিম উম্মাহর প্রশিক্ষণের ছয়টি নির্দেশিকা

সামনে ও পিছনের সূরার সাথে সম্পর্ক

ক) সূরা বাকারার মধ্যে ইহুদিদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, আর সূরা আলে ইমরানের মধ্যে খ্রিস্টানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

খ) সূরা বাকারার মধ্যে مَغْضُوْب عليهم এর তাফসীর করা হয়েছে, আর সূরা আলে ইমরানের মধ্যে ولا الضالين এর তাফসীর করা হয়েছে।

গ) সূরা বাকারার শেষের আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের ওপর আধিপত্য অর্জন করার জন্য দোয়া করতে শিখিয়েছেন, আর এখানে সূরা আলে ইমরানের মধ্যে কাফেরদের উপর আধিপত্য পাওয়ার অনেকগুলি কৌশল শিখিয়েছেন।

ঘ) সূরা বাকারার মধ্যে হযরত আদম (আঃ)-এর অলৌকিক সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর সূরা আলে ইমরানের মধ্যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক সৃষ্টির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

ঙ) সূরা বাকারার মধ্যে মুসলিম উম্মাহকে মধ্যমপন্থী উম্মত ঘোষণা করা হয়েছে, আর এখানে সূরা আলে ইমরানের মধ্যে মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ উম্মত ঘোষণা করা হয়েছে।

চ) যেমনি ভাবে সূরা বাকারাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দুয়ার মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে, ঠিক তেমনি সূরা আলে

ইমরানকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়ার মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে।

ছ) সূরা বাকারার মধ্যে آمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ এই বাক্যের মাধ্যমে আহলে কিতাবকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে, আর সূরা আলে ইমরানের মধ্যে اَاَسْلَمْتُمْ শব্দের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

জ) সূরা বাকারার মধ্যে ইসলাম ধর্ম এবং ইয়াহুদী ধর্মের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে আর এখানে সূরা আলে ইমরানের মধ্যে ইসলাম ধর্ম এবং খ্রিস্টধর্মের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে।

সূরার শুরু এবং শেষের অংশের মধ্যে সম্পর্ক

সূরার শুরুতে আসমানী কিতাব সমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সূরার শেষের দিকে ওই আসমানী কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনতে বলা হয়েছে।

সূরা আলে ইমরানের নামকরণ

সূরা আলে ইমরানেরও একাধিক নাম পাওয়া যায় যেমন: আলে ইমরান, যাহরা,

১) আলে ইমরান: ,,আল,, আল এটি একটি আরবি শব্দ

যার অর্থ হচ্ছে বংশধর, ফ্যামিলির সদস্য, আর ,,ইমরান,, এটি হযরত মারিয়াম আলাইহাস সালামের পিতা তথা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নানার নাম, এই সূরাটিকে আলে ইমরান নাম রাখার কারণ হচ্ছে এই সূরার মধ্যে বিশেষভাবে হযরত ইমরান আলাইহিস সালামের বংশধর এবং ফ্যামিলির বর্ণনা এসেছে, তাই এই সূরাটির নাম আলে ইমরান রাখা হয়েছে।

২) যাহরা: যেমনটি সূরা বাকারার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছিল যে সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান দুনটিকেই হাদিসের মধ্যে ,যাহরাওয়ান, বলা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, নূর, যে ব্যক্তি সবসময় সূরা বাকারারএবং সূরা আলে ইমরানের তেলাওয়াত করবে এটি তার জন্য উজ্জ্বলতা এবং নূরের উৎস হবে, এই কারণেই এটিকে সূরা যাহরা বলা হয়।

সূরা আলে ইমরানের ফজিলত

১) হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে বলতে শুনেছি: তোমরা কুরআন শরীফ পড়তে থাকো, কেননা এটি কেয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে, এবং দুইটি উজ্জ্বল সূরা তথা সূরা বাকারা ও সূরা আলে

ইমরান পড়তে থাকো, কেননা এটি কিয়ামতের দিন মেঘমালা হয়ে বা ছাউনি হয়ে বা উড়ন্ত পাখির সারির মত হয়ে আসবে, এবং তেলাওয়াতকারীর পক্ষ নিয়ে আল্লাহর সামনে ঝগড়া করবে। (মুসলিম শরীফ ১৮৭৪)

২) হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একদিন ফজরের সময় নবী সাঃ কে নামাজের খবর দেওয়ার জন্য এসে দেখতে পেলেন নবী সাঃ কান্না করেছেন, তখন হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কেন কান্না করছেন ? আল্লাহ তাআলা তো আপনার আগে পিছে সমস্ত ভুলত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন: হে বিলাল আমি কেন কান্না করব না? অথচ আজকের রাত্রে মহান আল্লাহ তায়ালা আমার উপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ সূরার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেছেন (সূরা আলে ইমরান ১৯০) তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন: ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলো কিন্তু তার মধ্যে চিন্তাভাবনা করল না। (সহী ইবনে হিব্বান ২/৩৮৭)

এক পলকের সূরা আলে ইমরান

যেমনটি উপরের নকশার মধ্যে দেখানো হয়েছে যে সূরা আলে ইমরানের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে **ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে তুলনা**, এই মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে তার দুইটি উপ বিষয় রয়েছে:

১) খ্রিস্টধর্মের বাস্তবতা।
২) ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিম উম্মাহর প্রশিক্ষণ।

সূরা আলে ইমরানের মোট আয়াত সংখ্যা ২০০, প্রথম উপ বিষয় অর্থাৎ খ্রিস্টধর্মের বাস্তবতা, এটি আয়াত নাম্বার ১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং দ্বিতীয় উপ বিষয়টি আয়াত নাম্বার ১০০ থেকে ২০০ পর্যন্ত বিস্তৃত, তাই আসুন সর্বপ্রথম প্রথম উপ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক,

প্রথম উপ বিষয়
খ্রিস্টধর্মের বাস্তবতা

এই উপ বিষয়ের মধ্যে অতি গুরুত্বের সাথে দুইটি বিষয়ের প্রতি সংলাপ ও আলোচনা রয়েছে: ১) খ্রিস্টধর্ম এবং একত্ববাদের আকিদা ও বিশ্বাস, ২) খ্রিস্টধর্ম এবং নবুয়তের আকিদা ও বিশ্বাস, এই দুইটি বিষয়ের প্রতি

আলোচনা ও সংলাপের আগে সংলাপের কয়েকটি নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এই পুরা উপ বিষয়টিকে আমরা একটি ভূমিকা ও দুইটি প্যারাগ্রাফের মাধ্যমে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ,

ভূমিকা: ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে পার্থক্য এবং সংলাপ ও আলোচনার নীতি

এই ভূমিকাটি আয়াত নাম্বার ১ থেকে ১৭ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই ভূমিকার মধ্যে তিনটি জিনিস বর্ণনা করা হয়েছে:

১) ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের মধ্যে পার্থক্য।
২) খ্রিস্টানদের সাথে আলোচনা ও সংলাপের নীতি।
৩) কোনো একটি জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার কি কি কারণ হতে পারে?

১) ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের মধ্যে পার্থক্য

ঈমানের তিনটি মূল অংশ রয়েছে: আল্লাহর প্রতি ঈমান,--রসুলের প্রতি ঈমান,--মৃত্যুর পরের জীবনের প্রতি ঈমান, প্রথমটিকে আমরা একত্ববাদের আকিদা ও বিশ্বাস নাম দিয়েছি, এবং দ্বিতীয়টিকে নবুওয়াতের আকিদা ও বিশ্বাস নাম দিয়েছে,

ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য একত্ববাদের আকিদা ও বিশ্বাস এবং নবুয়াতের আকিদা

ও বিশ্বাসের মধ্যে, কেননা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মুসলমানদের নিকট একজন রাসুল, অন্যদিকে খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে রাসুল থেকে খোদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, তাই একত্ববাদের আকিদা পাওয়া যায়নি,

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের নিকট একজন নবী ও রাসূল, অন্যদিকে খ্রিস্টানরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও রিসালাতের অস্বীকার করে, তাই রিসালাতের আকিদাও পাওয়া যায়নি, এই দুইটিই ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের মধ্যে আসল পার্থক্য।

এবার আসুন একত্ববাদের আকিদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে খ্রিস্টানদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করা যাক:

১) খোদা হওয়ার জন্য চিরন্তন হওয়া দরকার অর্থাৎ যার কোনো মৃত্যু নেই, যেমনটি আল্লাহ তাআলা দুই নাম্বার আয়াতে বলেছেন, এখন প্রশ্ন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কি চিরন্তন? উনার কি মৃত্যু আসবে না? অবশ্যই আসবে, শেষ জামানায় আসমান থেকে অবতীর্ণ হওয়ার পর উনিও মৃত্যুবরণ করবেন, মনটি আল্লাহ তায়ালা সূরা রহমানে বলেছেন كل من عليها فان.

২) খোদা হওয়ার জন্য পরিপূর্ণ নিখুঁত শক্তি ও ক্ষমতার

প্রয়োজন, যেমনটি আল্লাহ তাআলার দুই নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করেছেন, এখন প্রশ্ন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কি এমন ছিলেন? নিঃসন্দেহে এমন ছিলেন না, কেননা পবিত্র কোরআনের অসংখ্য জায়গায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর বান্দা তথা গোলাম বলা হয়েছে, আর বান্দার শক্তি ও ক্ষমতা কখনো পরিপূর্ণ ও নিখুঁত হতে পারে না।

৩) খোদা হওয়ার জন্য সর্বজ্ঞতা ও নিখুঁত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাম্বার পাঁচের মধ্যে বর্ণনা করেছেন, এখন প্রশ্ন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কি নিখুঁত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন?
নিঃসন্দেহে এমন ছিলেন না, কেননা আমাদের নবী যিনি সমস্ত নবীদের সরদার তিনিও নিখুঁত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না, তাহলে ঈসা আলাইহিস সালাম কি করে নিখুঁত জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে?

৪) খোদা হওয়ার জন্য খা'লিক, সৃষ্টিকর্তা হওয়া প্রয়োজন,
এমন সৃষ্টিকর্তা যিনি সৃষ্টিকে মাতৃগর্ভে রূপ, আত্মা এবং জীবন ও অন্যান্য পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বে আনেন, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ছয় নাম্বার আয়াতের মধ্যে

বর্ণনা করেছেন, এখন প্রশ্ন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কি এমন ছিলেন?

এইসব গুনাবলী, পাওয়ার ও ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য প্রযোজ্য, এই সকল গুণাবলী ছাড়া কেউ খোদা হতে পারে না, তাহলে খ্রিস্টানরা কি করে এই সব গুণাবলী ব্যতীত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে খোদা দাবি করে থাকে?

------এবার আসুন নবুওয়াতের আকিদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা যাক, নবী হলেন তিনি যার উপরে কিতাব অবতীর্ণ হয়, আর খ্রিস্টানরা একথা বিশ্বাস করে যে তাওরাত গ্রন্থ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং ইঞ্জিল গ্রন্থ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে তারা এটি কেন বিশ্বাস করে না যে কুরআনে কারিম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে? সূরা আলে ইমরানের ৩ নাম্বার আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

২) খ্রিস্টানদের সাথে সংলাপের নীতি

সূরা আলে ইমরানের শুরুতে তথা ভূমিকার মধ্যে আল্লাহ তাআলা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ম ও নীতি

বর্ণনা করেছেন, সেটি হল কুরআন শরীফের মধ্যে যত আয়াত রয়েছে সেগুলিকে আল্লাহ তা'আলা দুই ভাগে ভাগ করেছেন: ১) মুহকাম আয়াত, ২) মোতাশাবেহ আয়াত,

১) মুহকাম আয়াত এবং তার বিধান: ঐ সমস্ত আয়াতকে মুহকাম বলা হয় যার অর্থ এমন স্পষ্ট হতে হবে যে একজন আরবি গ্রামারের শিক্ষিত ব্যক্তি সহজেই তা বুঝতে পারে, এবং যার অর্থের মধ্যে মান্যগণ্য ওলামাদের কোনো মতভেদ থাকেনা, এবং যার অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা থাকে না,(তাফসীরে ওসমানী, মারিফুল কুরআন)

এক কথায় কুরআন শরীফের ওই সমস্ত আয়াত যার মধ্যে আকিদা, আমল, হালাল হারাম, এবং ইসলামি বিধি-বিধান, সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে সেগুলিকেই মুহকাম আয়াত বলা হয়,

মুহকাম আয়াতের বিধান হচ্ছে তার তার উপর ঈমান আনা এবং আমল করা উভয়টিই ফরজ এবং ওয়াজিব।

২) মোতাশাবেহ আয়াত এবং তার বিধান: মুহকাম আয়াতের ঠিক বিপরীত হচ্ছে মোতাশাবেহ হায়াত, অর্থাৎ যার অর্থ একজন আরবি গ্রামারের শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট না হয়, এবং যার অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মান্যগণ্য ওলামাদের মধ্যে মতভেদ হয়ে যায়, এবং যার অর্থ হয়তো

একেবারেই অজানা থাকে, বা শাব্দিকঅর্থ জানা থাকলেও প্রকৃত অর্থের মধ্যে অস্পষ্টতা থেকে যায়,

এই সমস্ত মতাশাহেব আয়াতের বিধান হচ্ছে, এগুলির উপর ঈমান আনতে হবে যে এগুলিও আল্লাহ তাআলার বাণী, এগুলির মধ্যে বেশি আলোচনা ও গবেষণা করা যাবে না, এবং তার অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বলতে হবে: আল্লাহই এগুলির অর্থ ভালো জানেন, এবং এই মোতাশাবেহ আয়াতগুলিকে কোনো ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে দলিল বানানো যাবেনা, আর এই সমস্ত আয়াতগুলি আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই, যে তারা এসব আয়াতগুলির অর্থ না জানা থাকা সত্ত্বেও এগুলির উপর ঈমান আনে কিনা, পবিত্র কুরআনের প্রায় ৯৫% আয়াত মুহকাম শুধুমাত্র কয়েক পারসেন্ট আয়াত মোতাশাবেহ রয়েছে।

এবার আসুন আসল বিষয়ের দিকে, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে رُوْحُ اللّٰهِ، كَلِمَةُ اللّٰهِ বলেছেন, যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আত্মা, আল্লাহর বাণী কিন্তু এগুলির প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, অর্থাৎ এগুলি মুতাশাবেহ হায়াতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু খ্রিস্টানরা এইসব শব্দগুলির মাধ্যমে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে নবী থেকে খোদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, অথচ

একটু আগেই মোতাশাবেহ আয়াতের বিধানে বলা হয়েছে যে এইসব আয়াতগুলিকে কোনো বিষয়ে দলিল বানানো যাবে না,

তাই আল্লাহ তায়ালা আয়াতের শেষের দিকে বলেছেন: যাদের দিলের মধ্যে রোগ, ব্যাধি ও অসুস্থতা রয়েছে কেবল তারাই ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য মোতাশাবেহ আয়াতের পিছনে লেগে থাকে, অথচ এই আয়াতগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, আর যাদের মধ্যে জ্ঞানের গভীরতা রয়েছে তারা বলে: আমরা এই মুতাশাবেহ আয়াত গুলোর উপর ঈমান রাখি, এগুলো সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এগুলোর অর্থ এবং ব্যাখ্যা জানা আমাদের জন্য জরুরি নয়, বরং আল্লাহই এগুলির অর্থ ও ব্যাখ্যা ভালো জানেন।

৩) পথভ্রষ্ট হওয়ার কি কি কারণ হতে পারে

এখানে ভূমিকার ১০ থেকে ১৭ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত একটি কোওম তথা একটি জাতির বিশেষ করে খ্রিস্টানদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কয়েকটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে:

1) ধন-সম্পদের প্রতি ভালবাসা।

2) সম্মান ও খ্যাতির প্রতি ভালোবাসা।

3) পার্থিব সুন্দর্য ও চাকচিক্যের প্রতি ভালোবাসা।

প্রথম পেরাগ্রাফ: খ্রিস্টধর্ম এবং একত্ববাদের বিশ্বাস

এই প্যারাগ্রাফটি আয়াত নাম্বার ১৮ থেকে ৬৪ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে একত্ববাদের আকিদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে খ্রিস্টানদের সাথে ডিবেট ও মুবাহেলা করা হয়েছে, তাই এখানে ডিবেটের কয়েকটি অংশ তুলে ধরা হয়েছে।(মুবাহেলা কী? এবং তার অর্থ ও ব্যাখ্যা নিচে বর্ণনা করা হবে)

১) একত্ববাদের আকিদা ও বিশ্বাস মহাবিশ্বের একটি অবিতর্কিত আকিদা ও বিশ্বাস

আমাদের একটু ভাবা দরকার যে এই পুরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কার কথা সবচেয়ে বেশি সত্য হতে পারে, এক কথায় তার উত্তর হবে আল্লাহ তা'আলা, যার কথায়, যার একটি সাধারণ বাণীতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, সেই আল্লাহ যখন কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে বলে যে: আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ে সাক্ষী দিচ্ছে তখন সেই কথাটির ওজন কত হতে পারে একটু চিন্তা করুন, ঠিক তেমনি সূরা আলে ইমরানের ১৮ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা একত্ববাদের আকিদা ও বিশ্বাসের বিষয়ে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই, একটি নয় দুটি নয় বরং তিন তিনটি সাক্ষী দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ ছাড়া

কোনো মাবুদ নেই,
_____প্রথম সাক্ষী আল্লাহ তা'আলার সাক্ষী,
_____দ্বিতীয় সাক্ষী ফেরেশতাদের সাক্ষী,
_____তৃতীয় সাক্ষী উলুল ইলম অর্থাৎ নবী রাসুল ও হক্কানী ওলামাদের সাক্ষী,

গোটা বিশ্বজগতের ভিতরে এবং বাইরে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা, তারপর নূরের তৈরি মাখলুকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে ফেরেস্তারা, এবং মাটির তৈরি মাখলুকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন নবী-রাসূলেরা, এই তিনটি শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষী উল্লেখ করে মহান আল্লাহতালা ঘোষণা করেছেন যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আল্লাহর কোনো শরীক নেই, তাহলে আজ খ্রিস্টানরা কিভাবে ঈসা আলাইহিস সালামকে খোদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দিল? কি করে ইয়াহুদিরা আজ উজাঈর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র ঘোষণা করলো? কি করে হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা আজ হাজারো দেবতা মেনে থাকে?

২) মুসলমানদের করণীয়

পিছনে আয়াত নাম্বার ১৮ এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতা, নবী রাসুল এবং হক্কানী ওলামাদের সাক্ষীর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, এখানে আয়াত নাম্বার ১৯ থেকে মুসলমানদের কয়েকটি করণীয় বর্ণনা করা হচ্ছে:

a) কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক মুসলমান যেন এই অকাট্য সত্যের তথা আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এর প্রচার ও প্রসার করতে থাকে।

b) একগুঁয়ে এবং পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তির সাথে অহেতুক বিতর্কে না জড়ায়।

c) বন্ধুত্ব এবং শত্রুতার বুনিয়াদ যেন আল্লাহ তা'আলা হয়,
অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য প্রকাশ করবে সে আমাদের বন্ধু আর যে তাঁর অবাধ্য সে আমাদের শত্রু।

d) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকে তোমাদের জীবনের মানদন্ড বানিয়ে নাও।

৩) ঈসা আলাইহিস সালামের পরিবার ও বংশধররাও একত্ববাদের বিশ্বাসের অনুসারী ছিলেন

সূরা আলে ইমরানের আয়াত নাম্বার ৩৪ থেকে হযরত ইমরান এবং তার পরিবারের বিভিন্ন ঘটনাক্রম তুলে ধরা হয়েছে যে কিভাবে হযরত ইমরানের স্ত্রী আল্লাহর কাছে মান্নত মেনে ছিল যে তার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে তাকে সে সমস্ত প্রকারের কাজ কর্ম থেকে মুক্ত

করে আল্লাহর জন্য ওকফ করে দিবেন, তারপর হযরত মারিয়াম আলাইহাস সালামের জন্ম এবং হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের তার দায়িত্ব গ্রহণ করা, তারপর বৃদ্ধ অবস্থায় হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের সন্তান জন্মগ্রহণ করা, তারপর পিতা ছাড়া হযরত মারিয়াম আলাইহিস সালামের গর্ভে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মগ্রহণ করা এই সমস্ত ঘটনাক্রম থেকে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায় যে

___হযরত ইমরান এবং তার স্ত্রী
___হযরত মারিয়াম আলাইহাস সালাম
___হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম
___হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম
___হযরত ইয়াহ্য়া আলাইহিস সালাম

তারা প্রত্যেকেই একত্ববাদের আকিদা ও বিশ্বাসের অনুসারী ছিলেন, এখন খ্রিস্টানদের কাছে প্রশ্ন তারা যে যিশু খ্রীষ্টকে ফলো করেন এমনকি তাকে আল্লাহর বান্দা থেকে পুত্র এবং শেষ পর্যন্ত খোদা বানিয়ে দিয়েছেন, সে স্বয়ং নিজে এবং তার চৌদ্দপুরুষ মহান আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের ঘোষণা করে গেছেন যে আল্লাহ এক, তার কোনো শরীক নেই, তার কোনো পুত্র নেই, তার কোনো স্ত্রী ও নেই, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তার সমকক্ষ কেউ নেই, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি,

যদি তোমরা শুধু এই ভিত্তিতে যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পিতা ছাড়া জন্য গ্রহণ করেছেন

এই কারণে তোমরা তাকে আল্লাহর পুত্র বা তিন খোদার মধ্যে থেকে একজন বলে থাকো, তাহলে হযরত আদম আলাইহিস সালামকেও তোমরা খোদা বল, কেননা আদম আলাইহিস সালাম তো পিতা-মাতা উভয়টি ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন, অথচ তোমরা তাকে খোদা মানো না, বরং তাকে নবীই মেনে থাকো, তাহলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে কেন উনাকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বানিয়ে দিলে?

৪) মুবাহেলা

„মুবাহেলা„ এটি মূলত কোনো একটি সংলাপ ও ডিবেট শেষ করার সর্বশেষ প্রচেষ্টা, সূরা আলে ইমরানের ৬১ নাম্বার আয়াতের মধ্যে এই মুবাহেলার বর্ণনা এসেছে, এই মুবাহেলা সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে একটু ইতিহাসের দিকে যেতে হবে,

সূরা আলে ইমরান ওই সময় অবতীর্ণ হয়েছিল যখন নাজরান এলাকার খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধি দল নবী সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়েছিল, এই প্রতিনিধি দলের সাথেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একত্ববাদের আকিদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে ডিবেট হয়েছিল, মুবাহেলার আয়াত তথা ৬১ নাম্বার আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত সূরার

শুরুর অংশে তাদেরকে বিভিন্নভাবে দলিলের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছিল,
এবং তাদের কাছে একত্ববাদের আকিদা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপরেও তারা বুঝে শুনে না বুঝার ভান করেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরানের ৬১ নাম্বার আয়াতটি অবতীর্ণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করেন যে আপনি তাদেরকে মুবাহেলা করার জন্য প্রস্তুত হতে বলুন,

মুবাহেলার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে একে অপরকে অভিশাপ দেওয়া,

পরিভাষায় মুবাহেলা বলা হয় যখন কোনো একটি ডিবেটের দুইটি গ্রুপের মধ্য থেকে কোনো একটি গ্রুপ দলিলের ভিত্তিতে হেরে যাওয়ার পরেও হার মানতে রাজি না হয় তখন সেই গ্রুপকে বলা হয়: এসো উভয় মিলে মুবাহেলা করি অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দোয়া করি হে আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে যে হকের উপরে নেই, যে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে সে যেন ধংস হয়ে যায়,

পরিশেষে প্রতিনিধি দলের খ্রিস্টানরা মুবাহেলা করতে রাজি হয়নি, বরং তারা বিপদে পড়ে ট্যাক্স দিতে রাজি হয়, এই মুবাহেলার ঘটনা সমস্ত আরববাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সবাই জানতে পারে যে খ্রিস্টান ধর্মে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে যে আল্লাহর পুত্র বলা

হয় কিংবা তিন খোদার মধ্যে থেকে একজন মানা হয়, সেটি একেবারে ভিত্তিহীন।

৫) শেষবারের মত এহলে কিতাবকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আবেদন।

সূরা আলে ইমরানের আয়াত নাম্বার ৬৪ আগ পর্যন্ত আহলে কিতাবের মধ্য থেকে শুধু খ্রিস্টানদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝানো হয়েছিল, তাদের ভুলত্রুটি গুলি তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল, এবং দলিলের ভিত্তিতে তারা হার মানতে বাধ্য হয়েছিল, তাই এখানে আয়াত নাম্বার ৬৪ থেকে এহলে কিতাবের দুনো গ্রুপ তথা ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয়কেই শেষবারের মতো ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো হচ্ছে,

আয়াতের শুরুতেই নবী সাঃ কে বলা হয়েছে যে আপনি আহলে কিতাবদেরকে বলুন: এসো আমরা সবাই মিলে অন্তত ওই বিষয়ের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাই যেটি আমাদের মধ্যে অবিতর্কিত, আর সেই অবিতর্কিত বিষয়টি হচ্ছে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত করব না, এবং আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করব না, এটিই হচ্ছে সেই অবিতর্কিত বিষয়, এমন কোনো নবী নেই এমন কোনো রাসূল নেই যিনি তার উম্মতকে এই বিষয়ের দাওয়াত দেননি, এমন

কোনো আসমানী কিতাব বা সহীফা নেই যার মধ্যে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি বরং প্রত্যেক নবী-রাসূলের, প্রতিটি আসমানী কিতাবের মূল দাওয়াতের বিষয় এটিই ছিল, অন্যান্য বিধি-বিধানের মধ্যে তো পার্থক্য করা হয়েছে, প্রত্যেক নবীকে যে সময় প্রেরণ করা হয়েছে সেই সময় উপযোগী বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একত্ববাদের বিষয়টি এমন যার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ: খ্রিস্টধর্ম এবং রিসালাতের আকিদা ও বিশ্বাস

এই প্যারাগ্রাফটি আয়াত নাম্বার ৬৫ থেকে ৯৯ পর্যন্ত বিস্তৃত, এখানে একটি জিনিস মনে রাখা দরকার যেটি আমি আগেও বর্ণনা করেছি যে ঈমানের মূল তিনটি অংশ, একটি হচ্ছে একত্ববাদের সাক্ষী দেওয়া, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সাক্ষী দেওয়া, তৃতীয়টি হচ্ছে মৃত্যুর পরের জীবনের বিশ্বাস রাখা, প্রথম প্যারাগ্রাফে একত্ববাদের বিশ্বাস বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাই এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে রিসালাতের আকিদা ও বিশ্বাসের দলিল এবং আহল কিতাবের কিছু একগুঁয়েমি এবং পক্ষপাতদুষ্ট কর্মকাণ্ডের বর্ণনা করা হয়েছে,

অ) রিসালাতের আকিদা এবং তার দলিল সমূহ

____এখানে আয়াত নাম্বার ৬৫ থেকে আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতা তুলে ধরা হয়েছে যে তিনিই হচ্ছেন সর্বশেষ নবী এবং তিনি যে শিক্ষা ও বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন তা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামেরই শিক্ষা ও বিধি-বিধান,

____তারপর আহলে কিতাবদেরকে একটি বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে তোমাদের লজ্জা করা উচিত যে তোমরা কিভাবে নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের অনুসারী এবং তার বংশধর মনে কর, এবং গর্বের সাথে নিজেদেরকে ইব্রাহিমের সন্তান বলে থাকো, অথচ তোমরা তো হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের শিক্ষাকে ছেড়ে দিয়েছো, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে একত্ববাদ ও তাওহীদের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছিলেন তোমরা তার মধ্যে পার্থক্য গড়ে তুলেছো, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম না ইহুদি ছিলেন না খ্রিস্টান ছিলেন, এই ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদ তো তোমারা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের হাজার বছর পরে তোমাদের নিজেদের মন মতো গড়ে তুলেছ, তাই তোমাদের লজ্জা করা উচিত, বরং হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সন্তান দাবি করার

সবচেয়ে উপযুক্ত হচ্ছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার অনুসারীরা, কেননা তারাই প্রকৃতপক্ষে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের শিক্ষাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন, এবং একত্ববাদ ও তাওহীদের আকিদার উপর পুরোপুরিভাবে বিদ্যমান রয়েছেন।

____হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও রিসালাতের সবচেয়ে বড় দলিল এখানে সূরা আলে ইমরানের আয়াত নাম্বার ৮১ মধ্য বর্ণনা করা হয়েছে এই আয়াতের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন: আর স্মরণ করো ওই সময়কে যখন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবীদের থেকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি; তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারী রূপে যখন একজন রাসূল আসবে- তখন তোমরা অবশ্যই তার উপর ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে,

তারপর আল্লাহ তায়ালা বলেন তোমরা কি তা স্বীকার করেছো এবং আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছো, তখন সমস্ত নবী-রাসূলরা এক সুরে বলেছিল, জি হাঁ, আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন তোমরা সাক্ষী থাকো আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লামের উপর ঈমান আনা প্রকৃতপক্ষে কোনো পার্থক্য ছাড়া সমস্ত নবী রাসূলের উপর ঈমান আনা স্বরূপ।

আ) আহলে কিতাবের কিছু কর্মকাণ্ড

আহলে কিতাবরা, যদিও তারা কিতাবের শিক্ষা এবং নবীদের শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান রাখার দাবি করে থাকে তবুও তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড গুলো বিদ্যমান:

১) তারা স্বয়ং নিজেরাই পথভ্রষ্ট।

২) তারা অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সব সময় সত্যকে লুকানোর চেষ্টা করে থাকে।

৩) অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তারা সব সময় হক্ব ও বাতিল তথা সত্য মিথ্যা কে গুলিয়ে ফেলার চেষ্টা করে।

৪) মুসলমানদেরকে ক্ষতি করার জন্য তারা কখনো ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মুসলমান হওয়ার দাবি করে থাকে।

৬) তাদের বেশিরভাগ একগুঁয়ে এবং পক্ষপাতদুষ্ট হয়।

৭) তারা সব সময় কাজে কাজে খেয়ানত করে থাকে।

৮) সুদখোরী তাদের কাছে সাধারণ বিষয়।

৯) তারা সব সময় আল্লাহ ও নবী রাসুলের প্রতি মিথ্যাচার করে থাকে।

১০) বনী ইসরাইলের ইয়াহুদী ব্যতীত তারা প্রত্যেকের ধন সম্পদকে হালাল মনে করে থাকে হোক সেটি যেকোনো

মাধ্যমে।

ই) আহলে কিতাবের কয়েকটি সন্দেহের উত্তর

প্রথম সন্দেহ: হে উম্মতে মুসলিমা তোমরা নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের অনুসারী দাবি করে থাকো অথচ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মিল্লাতে উটের মাংস হারাম ছিল, অথচ তোমরা উটের মাংসকে হালাল মনে কর,

উত্তর: উটের মাংস না মিল্লাতে ইব্রাহিমে হারাম ছিল, না হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এটিকে হারাম করেছেন, বরং ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের যুগের অনেক পরে উনার নাতি হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম একদিন আল্লাহর কাছে মান্নত করেন যে, উনার একটি অসুস্থতা ছিল যদি আল্লাহ তায়ালা তা ঠিক করে দেন তাহলে তিনি তার সবচেয়ে প্রিয় খাবার তথা উটের মাংসকে নিজের উপর হারাম করে দিবেন, এবং পরবর্তীতে মূসা আলাইহিস সালামের যুগে বনী ইসরাইল তথা ইহুদীদের নাফরমানীর কারণে তাদের উপর উটের মাংস হারাম করে দেওয়া হয়, তাই মুসলিম উম্মার যুগে সেই পুরাতন বিধান তথা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের যুগে যে উটের মাংস হালাল ছিল না তা পুনরায় ফিরে আসে (আসান তরজমা কুরআন, মুফতি তাকী ওসমানী সাহেব)

দ্বিতীয় সন্দেহ: তোমাদের দাবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা অতীতের সমস্ত নবী রাসুলদের অনুসরণ করা স্বরূপ, অথচ অতীতের সমস্ত নবী-রাসূলদের কিবলা আল-আকসা মসজিদ ছিল, আল আকসা মসজিদ কাবা শরীফ থেকেও উত্তম, এবং এটি পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর, তাই তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্য নও।

উত্তর: আয়াত নাম্বার ৯৬ এবং ৯৭ এর মধ্যে তাদের এই সন্দেহের উত্তর দেওয়া হয়েছে, এই দুইটি আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ তায়ালা কাবা শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন এবং এটি কি কি কারণে শ্রেষ্ঠ তাও বর্ণনা করেছেন:

1) কাবা শরীফ পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইবাদত খানা এবং পৃথিবীর জমিনে নির্মিত সর্বপ্রথম ঘর।

2) সেখানে এমন কিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে যেটি তার শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত করে যেমন: মাকামে ইব্রাহিম, জমজম কূপ এবং হাতিম ইত্যাদি।

3) যে ব্যক্তি হারামের মধ্যে অর্থাৎ কাবা শরীফের নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে ঢুকে যায় তার জন্য সেফটির গ্যারান্টি হয়ে যায়।

শ্রেষ্ঠত্বের এই তিনটি কারণ তো স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাফসীরের বড় বড়

স্কলাররা কাবা শরীফের শ্রেষ্ঠত্বের আরো কিছু কারণ বর্ণনা করেছেন যেমন:

4) কাবা শরীফ নির্মিত করার হুকুম স্বয়ং আল্লাহতালা দিয়েছেন।

5) তার নকশা স্বয়ং জিব্রাইল আলাইহিস সালাম বানিয়েছেন।

6) তার রাজমিস্ত্রি স্বয়ং ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন।

7) এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর সাথে সাহায্যকারী এবং শ্রমিক হিসাবে স্বয়ং ইসমাইল আলাইহিস সালাম কাম করেছেন।

দ্বিতীয় উপ বিষয়
মুসলিম উম্মাহর প্রশিক্ষণ

এই উপ বিষয়টি আয়াত নম্বর ১০০ থেকে ২০০ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই উপ বিষয়ের মধ্যে মূলত দুইটি প্যারাগ্রাফ বর্ণনা করা হয়েছে ১) মুসলিম উম্মাহর পাঁচটি সাংগঠনিক নীতি, ২) মুসলিম উম্মাহর প্রশিক্ষণের ছয়টি নির্দেশিকা,

প্রথম প্যারাগ্রাফ: মুসলিম উম্মাহর পাঁচটি সাংগঠনিক নীতি ও মুসলমানদের সম্মিলিত শক্তির জন্য করণীয়

এই প্যারাগ্রাফটি আয়াত নাম্বার ১০০ থেকে ১২০ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে মুসলিম উম্মাহর পাঁচটি সাংগঠনিক নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, আর সেগুলি হল:

১) জাতীয় পরিচয় সুরক্ষা করা: আয়াত নাম্বার ১০০ এবং ১০১ এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অন্য জাতি বিশেষ করে ইহুদী-খ্রিস্টানদের অনুসরণ ও অনুকরণ নিজেদের জাতীয় পরিচয়কে ক্ষুন্ন করে, তাই ইসলামে অন্যের অনুসরণ ও অনুকরণকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

২) তাকওয়া অর্জন করা: তাকওয়া ছোট একটি আরবি শব্দ কিন্তু তার গভীরতা অনেক বেশি, তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে: ভয় করা, কোনো জিনিসকে এড়িয়ে চলা, পরিভাষায় তাকওয়া বুঝানোর জন্য আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর তাফসীরকে পেশ করতে পারি যেটি তাকওয়ার তাফসীরে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ:

___আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা,
___তার নাফরমানী না করা, তথা অবাধ্য না হওয়া
___আল্লাহ তাআলাকে স্মরণে রাখা,
___তাকে না ভুলা,
___সব সময় আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞ থাকা,
___তার অকৃতজ্ঞ না হওয়া,

তাকওয়ার কয়েকটি স্তর রয়েছে:
নিম্নস্তর: তাকওয়ার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে কুফুর ও শিরিক থেকে বেঁচে থাকা, তাকওয়ার এই স্তরের ভিত্তিতে প্রত্যেক মুসলমানকে হোক সে গুনাহগার, মুত্তাকি বলা যেতে পারে,
পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় এই অর্থেও তাকওয়া শব্দ ব্যবহার হয়েছে।

মধ্যম স্তর: তাকওয়ার মধ্যম স্তর যেটি মূলত কাঙ্খিত, সেটি হল প্রত্যেক ওই জিনিস থেকে বেঁচে থাকা যেটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট অপছন্দনীয়, কুরআন ও হাদিসের মধ্যে তাকওয়ার যে সমস্ত ফাজায়েল বর্ণিত হয়েছে সেটি মূলত এই স্তরের তাকওয়ার জন্যই।

সর্বোচ্চ স্তর: আপন হৃদয়কে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে রক্ষা করা, এবং আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও তার সন্তুষ্টি অর্জনে এটিকে ব্যস্ত রাখা, তাকওয়ার এই স্তর নবী-রাসূল এবং বিশেষ কিছু আওলিয়া আল্লাহদের নসিব হয়ে থাকে।

এখানে সূরা আলে ইমরানের ১০২ নাম্বার আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সমস্ত মুসলমানদেরকে আদেশ করেছেন: হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর, এবং প্রকৃত মুসলমান হওয়া ছাড়া কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।

৩) নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা: এখানে সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নাম্বার আয়াতের মধ্যে মুসলমানদের সম্মিলিত শক্তি গড়ে তোলার জন্য তৃতীয় মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি হল গোটা মুসলিম জাতি যেন কুরআন শরীফের উপর ভিত্তি করে নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।

৪) দায়িত্ব ও কর্তব্যের অবহেলা না করা: সূরা আলে ইমরানের ১১০ নাম্বার আয়াতের মধ্যে মুসলমানদের সম্মিলিত শক্তিকে বিদ্যমান রাখার জন্য চতুর্থ করণীয় বর্ণনা করা হয়েছে, আর সেটি হলো ভালো কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা, এটি প্রত্যেক মুসলমানের দ্বীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য, এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের কারণেই মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ উম্মত ঘোষণা করা হয়েছে।

৫) কাফের ও মুনাফিকের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব না করা:

এখানে সূরা আলে ইমরানের ১১৮ নাম্বার আয়াতের মধ্যে মুসলমানদের পঞ্চম করনীয় বর্ণনা করা হয়েছে, আর সেটি হল কোনো কাফের ও মুনাফিকের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব করা যাবে না, এর চারটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে:

১) কাফের, মুনাফিকরা তোমাদের ক্ষতি করতে কোনো

দ্বিধাবোধ করে না।
২) তারা আন্তরিকভাবে কামনা করে যে, তোমাদের দ্বীনি ও পার্থিব জীবনে তোমরা কষ্ট ও দুর্দশায় জর্জরিত হও।
৩) তাদের চেহারা ও কথাবার্তা থেকে তোমাদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা প্রকাশ পায়।
৪) তোমাদের প্রতি তাদের যে ঘৃণা ও হিংসা তাদের অন্তরে লুকায়িত রয়েছে সেগুলি তাদের বাহ্যিক ঘৃণা ও শত্রুতা থেকেও অতি ভয়ংকর কর।

দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ: মুসলিম উম্মাহর প্রশিক্ষণের ছয়টি নির্দেশিকা

এই প্যারাগ্রাফটি আয়াত নাম্বার ১২১ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই প্যারাগ্রাফের শুরুতে ইসলামের বিখ্যাত দুইটি যুদ্ধের বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি হল বদরের যুদ্ধ এবং ওহুদের যুদ্ধ, এর মধ্য থেকে প্রথমটির মধ্যে মুসলমানরা জয়লাভ করেছিল এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছিল, দ্বিতীয় যুদ্ধ তথা ওহুদের যুদ্ধের মধ্যে মুসলমানদের পরাজয়ের অনেকগুলি কারণে মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, সেই যুদ্ধে যুদ্ধের সেনাপতি তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ মানতে গিয়ে কিছু সংখ্যক সাহাবাদের থেকে অবহেলা হয়ে গিয়েছিল, যেটি আল্লাহ তায়ালা এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে বর্ণনা

করেছেন,
সাথে সাথে মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সান্ত্বনাও দিয়েছেন, প্রত্যেক যুদ্ধের জয় পরাজয় থাকবেই, কিন্তু এই পরাজয় দেখে হার মানলে হবেনা, বরং এই পরাজয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, এই পরাজয়ের কি হিকমত হতে পারে, এবং পরাজয়ের কি কি কারণ হতে পারে তা পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে, এমতাবস্থায় সেনাপতির সাথে সৈনিকদের ব্যবহার কি রকম হতে হবে, এইসব বিষয়গুলো সামনে রেখে এখানে মুসলিম উম্মাহর প্রশিক্ষণের ছয়টি নির্দেশিকা বর্ণনা করা যাচ্ছে:

1) প্রথম নির্দেশিকা: কঠিনতা ও প্রতিবন্ধক অবস্থায় হিকমতের দিকে লক্ষ্য রাখা,

জয় পরাজয় এবং প্রত্যেক কঠিনতা ও প্রতিবন্ধক অবস্থায় আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার হিকমতের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত, অনেক সময় কোনো জিনিস বাহ্যিকভাবে আমাদের কাছে অশুভনীয় ও অকল্যাণকর মনে হয়, কিন্তু তার হিকমতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তার মধ্যেও আমাদের জন্য অনেক কল্যাণ রয়েছে, যেমন ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে পরাজয় হয়েছিল তার মধ্যেও অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে:
১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ছোট থেকে ছোট আদেশের অবহেলা করলে কতটুকু

ক্ষতি হতে পারে তা বুঝে আসা।
২) যাতে এই বিষয়টি বুঝে আসে যে, জয় পরাজয় সবই আল্লাহর হাতে, জয় পরাজয়ের বিত্তি সেনাবাহিনীর প্রাচুর্য ও শক্তির মধ্যে নয়।

৩) যাতে করে কিছু সংখ্যক মুসলমান শহীদের মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

৪) যাতে করে মুসলমানদের মধ্যে নতুন করে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরি হয়।

৫) অনেক সময় যুদ্ধরত অবস্থায় সেনাপতির মৃত্যুর খবর আসতে পারে, এমতাবস্থায় হিম্মত হারলে হবেনা বরং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

2) দ্বিতীয় নির্দেশিকা: কঠিনতা ও প্রতিবন্ধকতার তিনটি কারণের দিকে লক্ষ্য রাখা,

এখানে সূরা আলে ইমরানের ১৫২ নাম্বার আয়াতে ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের তিনটি কারণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং আমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে প্রত্যেক কঠিনতা ও প্রতিবন্ধকতার পিছনে মূলত এই তিনটি কারণ হয়ে থাকে,
১) দুর্বলচিত্রতা,

২) নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্য,
৩) সেনাপ্রধানের অবাধ্যতা,

3) তৃতীয় নির্দেশিকা: মুনাফিকদের ভূমিকা

এখানে সূরা আল ইমরানের ১৫৪ নম্বর আয়াত থেকে ১৫৮ নম্বর আয়াত পর্যন্ত মুসলমানদের ইউনিটি ভঙ্গ করার জন্য মুনাফিকদের দুইটি ভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছে:

১) মুসলিম উম্মাহকে তাদের নেতার প্রতি সন্দেহপ্রবণ করে তোলা, যেমনটি আজকাল মুসলমানদের একটি গ্রুপ জনসাধারণকে আলেম-ওলামাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে, তারা বলে থাকে কোনো আলেম-ওলামাকে অনুসরণ করা যাবে না, কোনো ইমামের মাযহাব মানা যাবে না, বরং প্রত্যেককেই স্বয়ং কোরআন হাদিস থেকে দ্বীন বুঝতে হবে, এই কথাটি বলতে যতটা সহজ মানা কারো জন্য সম্ভব নয়, যদি এমনটি হতো তাহলে যারা এই কথা বলছে তাদের জন্য উচিত ছিল যে তারা কোনো অনুষ্ঠানে বা কোনো প্রোগ্রামে তাদের কোনো শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া, কারণ তাদের শ্রোতারা তাদেরকে প্রশ্ন করবে কেন ? তাদের উচিত ছিল একথা বলা যে তোমরা স্বয়ং কোরআন হাদিস থেকে দ্বীন বোঝো নাও, আমাদেরকে জিজ্ঞেস করো না, অথচ আমরা এটি কখনো দেখতে পাই না, আমি মনে করি

তাদের জন্য সূরা সাফের দুই নাম্বার আয়াতটিই যথেষ্ট যেখানে বলা হয়েছে: হে ঈমানদারগণ তোমরা এমন কথা কেন বলে থাকো যার উপর তোমরা নিজেরাই আমল করো না।

২) মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করা।

4) চতুর্থ নির্দেশিকা: মুসলিম উম্মাহর নেতার ভূমিকা

এখানে সূরা আলে ইমরানের ১৫৯ নাম্বার আয়াত থেকে ১৬৫ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত একজন মুসলিম উম্মাহর নেতার বিশেষ করে একজন মুসলিম সেনাপ্রধানের আচার ব্যবহার কি রকম হওয়া দরকার তা তুলে ধরা হয়েছে:

১) তাকে কোমল হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে।

২) তাকে মৃদুভাষী হতে হবে।

৩) তার মধ্যে ক্ষমা করার প্রবণতা থাকতে হবে।

৪) তার অধীনস্থদের জন্য সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া ও ইস্তেগফার করতে হবে।

৫) প্রতিটি কাজ অধীনস্থদের সাথে মাশওয়ারা করে করতে হবে।

5) পঞ্চম নির্দেশিকা: আহলে কিতাবের ভূমিকা

এখানে সূরা আলে ইমরানের ১৮০ নাম্বার আয়াত

থেকে ১৮৮ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর বিপক্ষে আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খ্রিস্টানদের কি ভূমিকা হতে পারে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে,

এক কথায় তারা নানা রকম কথাবার্তার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে, এমতাবস্থায় মুসলমানরা যদি ধৈর্য এবং তাকওয়ার সাথে কাজ করতে থাকে তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তি তাদেরকে থামাতে পারবেনা।

6) ষষ্ঠ নির্দেশিকা: মুসলিম উম্মাহর ভূমিকা

এখানে সূরা আলে ইমরানের আয়াত নাম্বার ১৯০ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত মুসলিম উম্মার কয়েকটি ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে:

১) গোটা সৃষ্টি জগতকে আল্লাহ তায়ালাকে চিনার এবং বুঝার মাধ্যম বানাতে হবে, পুরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো জিনিস আল্লাহ তায়ালা অকারণে সৃষ্টি করেননি, বরং তার প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে তাকে চেনার, তার ওপর ঈমান আনার বহু নিদর্শন রয়েছে।

২) আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদেরকে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

৩) সর্বক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার জন্য আমাদেরকে চারটি কাজ করতে হবে:

____**সবর তথা ধৈর্য:** দ্বীনে ইসলামের উপর অবিচল

থাকতে হবে, কঠিনতা ও দুর্দশার কারণে মন ছোট করা যাবে না।

____**মুসাবারা:** অর্থাৎ শত্রুর মোকাবেলায় অবিচল ও অটল থাকার ক্ষেত্রে শত্রুর থেকে বেশি সাহস দেখাতে হবে।

____**মুরাবাতা:** অর্থাৎ ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য সব সময় রেডি থাকতে হবে।

____**তাকওয়া:** সব সময় সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে হবে।

ইতিহাসের সাক্ষী

হযরত ইমরান এবং উনার পরিবার

সূরা আলে ইমরানের ৩৫ নাম্বার আয়াত থেকে হযরত ইমরান এবং উনার পরিবারের বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে সূরা আলে ইমরানের মধ্যে আসল উদ্দেশ্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম, এবং উনার জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা, যেহেতু হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম উনার মা হযরত মারিয়ামের গর্ভে পিতা ছাড়া অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই এখানে সংক্ষেপে উনার মা হযরত মারিয়ামের জন্মের ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে,

হযরত মারিয়ামের পিতার নাম ইমরান, এবং মায়ের নাম হান্না বিনতে ফাকুজা, হযরত মারিয়ামের মা হান্না বিনতে ফাকুজার কোনো সন্তান ছিল না, তাই উনি মান্নত করেছিলেন, যদি ওনার কোনো সন্তান হয় তাহলে তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের কিদমত করার জন্য অকফ করে দিবেন, এবং তাকে দিয়ে দুনিয়ার কোনো কাজকর্ম করাবেন না, হযরত মারিয়াম যখন মায়ের গর্ভে ছিলেন তখনই উনার পিতা ইমরান যিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের ইমাম ছিলেন উনার মৃত্যু হয়ে যায়, হযরত মরিয়মের জন্মের পর উনার মা উনাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের ওই সময় যারা ইমাম মোয়াজ্জিন ছিল তাদের কাছে নিয়ে আসেন, এবং হযরত মারিয়ামকে তাদের কাছে দিয়ে দেন, তখন সবাই হযরত মারিয়ামকে লালন পালন করতে আগ্রহ প্রকাশ করল, হযরত মারিয়ামের পিতা ইমরান যিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের ইমাম ছিলেন, যদি উনি জীবিত থাকতেন তাহলে উনি নিজেই লালন পালন করতেন, তাই হযরত মারিয়ামকে লালন পালনকে কেন্দ্র করে বাইতুল মুকাদ্দাসের ইমাম, মুয়াজ্জিনদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাদের মধ্যে হযরত জাকারিয়াও ছিল, যিনি হযরত মারিয়ামের খালু ছিলেন, উনি বলেন যেহেতু হযরত মারিয়ামের খালা আমার স্ত্রী, তাই আমিই মারিয়ামকে লালন পালনের বেশি হক রাখি, কিন্তু অন্যরা এতে রাজি হলো না, শেষ পর্যন্ত লটারির মাধ্যমে হযরত মারিয়ামের লালন পালনের বিষয়টি নির্ধারিত হয়, এবং লটারিতে

হযরত জাকারিয়ার নাম আসে,

এখানে লটারির পদ্ধতিটি একটু ব্যতিক্রম ছিল, লটারি এইভাবে করা হয় যে সবাই সমুদ্রের মধ্যে কলম ফেলবে, এবং যার কলম পানির স্রোতের বিপরীত দিকে বইবে তাকে নির্ধারিত করা হবে, শেষ পর্যন্ত এভাবে হযরত জাকারিয়া নির্ধারিত হয়, হযরত জাকারিয়া হযরত ইয়াহয়া আলাইহিস সালামের পিতা ছিলেন।(মারেফুল কোরআন ও আসান তরজমা কোরআন)

উহুদের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সূরা আলে ইমরানের মধ্যে ইসলামের দুটি বিখ্যাত যুদ্ধ তথা বদরের যুদ্ধ, এবং ওহুদের যুদ্ধে দুনটিরই বর্ণনা এসেছে, কিন্তু এখানে বদরের যুদ্ধের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে, বদরের যুদ্ধকে ব্যাখ্যার সাথে সূরা আনফালের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই সেখানেই আমরা বদরের যুদ্ধের বর্ণনা করবো, এই সূরার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ওহুদের যুদ্ধকে হাইলাইট করা হয়েছে এবং ৫৫ আয়াতের মধ্যে এই যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে,

বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের বদলা:

হিজরতের দ্বিতীয় বৎসরে ইসলামের প্রথম বড় যুদ্ধ

তথা বদরের যুদ্ধে মক্কার কাফেরদের অনেক বড় পরাজয় হয়েছিল, সেই যুদ্ধে মক্কার বড় বড় সরদাররা মৃত্যুবরণ করেছিল, এই যুদ্ধের পরের বছর তথা হিজরতের তৃতীয় বছরে মক্কার কাফেররা পুনরায় সম্পূর্ণ তৈরীর সাথে যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য মদিনার দিকে অগ্রসর হতে থাকলো এবং মদিনার পাশেই ওহুদ পাহাড়ের কাছে এসে অবস্থান নিল, ওহুদ পাহাড়ের পাশে এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণে এটিকে ওহুদের যুদ্ধ বলা হয়।

কাফেরদের সৈন্যবাহিনী:

১) কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা তিন হাজারের মতো ছিল।
২) দুইশ অশ্বারোহী বাহিনী ছিল।
৩) সাতশো সাঁজোয়া সৈন্য ছিল।
৪) তিন হাজার উট ছিল।
৫) সৈন্যকে আনন্দ দেওয়ার জন্য ৫০০ নারীও ছিল।

মুসলমানদের সৈন্যবাহিনী:

মক্কার কাফেরদের এই তিন হাজার সৈন্যবাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য মুসলমানদের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০।

জাবালে রুমাত:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবাইরের (রাঃ) নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি সৈন্য ব্যাটালিয়ানকে কাফেরদের আনুমানিক হামলা থেকে বাঁচানোর জন্য পিছনের দিকে একটি ছোট পাহাড়ের উপর তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দেন, সেই ছোট পাহাড়টিকে জাবালে রুমাত বলা হয়, এবং তাদেরকে আদেশ করেন যে, যুদ্ধে আমরা জিতে যাই বা হেরে যাই কোনো পরিস্থিতিতেই তোমরা এই পাহাড় ছাড়বেনা।

যুদ্ধের শুরু:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামিক সৈন্যদেরকে এমনভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছেন যে, কাফেররা সামনাসামনি লড়াই করতে বাধ্য হয়, এবং তারা তাদের অশ্বারোহীদেরকে ব্যবহার করতে সুযোগ পায়নি, অন্যদিকে একেবারে শুরুতে ব্যক্তিগত মোকাবেলায় তাদের বড় বড় আটজন কমান্ডার নিহত হয়,
যার কারণে শুরুতেই তারা সাহস হারিয়ে ফেলে, হযরত আলী, হযরত হামজা এবং হযরত আবু দুজানার মত ইসলামী সিংহদের শক্তিশালী হামলায় যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে তারা পালাতে বাধ্য হয়।

জিতে যাওয়া যুদ্ধ পরাজয়ে পরিণত

জাবালে রুমাতের উপরে যে ৫০ জন সৈন্যদেরকে

আসন্ন হামলা থেকে বাঁচানোর জন্য দাঁড় করানো হয়েছিল, তারা যখন দেখতে পেল যে কাফেররা পরাজয় বরণ করে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের মধ্য থেকে প্রায় ৪০ জনই ওই স্থান ত্যাগ করে মালে গনিমত জমা করার জন্য চলে যায়, তাদের কমান্ডার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাঃ তাদেরকে বারবার বারণ করা সত্ত্বেও তারা তার কথা মানেনি, অবশেষে ওই পাহাড়ের উপর মাত্র ১০ জন সৈন্য থেকে যায়,

হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ ওই সময় কাফেরদের অশ্বারোহীদের কমান্ডার ছিলেন, তিনি তখনও মুসলমান হননি, তিনি যখন দেখতেপেলেন পিছনের দিকে জাবালে রুমাতের সৈন্যরা তাদের স্থান ত্যাগ করেছে, তখন তিনি তার অশ্বারোহীদের নিয়ে পিছন দিক দিয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করে দেয়, সামনের দিক দিয়ে কাফেরদের যে সৈন্যরা পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যাচ্ছিল তারাও যখন দেখতে পেল যে পিছন দিক দিয়ে খালিদ মুসলমানদের উপর শক্তিশালী হামলা করেছে, তখন তারাও ফিরে এসে সামনের দিক থেকেও মুসলমানদের উপর হামলা করে দেয়, এইভাবে মুসলমানদের জিতে যাওয়া যুদ্ধ পরাজয়ে পরিণত হয়।

যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা:

এই যুদ্ধে কাফেরদের মধ্য থেকে ২২ জন নিহত হয়,

অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্য থেকে ৭০ জন শহীদ হয়ে যায়, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে শহীদদের সরদার বলা হয়।

(খোলাসাতুল কোরআন, মাওলানা আসলাম শাইখুপুরী)